যায়যায়দিন ২৮ ভাদ্র তারিখ ... 23 SEP 2007 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম

প্রাথমিক শিক্ষার বাইরে ৩০ লাখ শিশু

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য শিশুর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, মানবিক ও নান্দনিক বিকাশ সাধন করা এবং তাদের উন্নত জীবনের স্বপ্ন দর্শনে উদ্বুদ্ধ করা। মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিফলিত হয় ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলাবোধ, শিষ্টাচারসহ সবার সঙ্গে মিলেমিশে বাস করার মানসিকতা। দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, দেশগঠন কাজে অংশগ্রহণ, সবার প্রতি সহযোগিতাপূর্ণ বন্ধুত্বসুলভ আচরণ, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ, বিশ্ব শান্তির চেতনায় আগ্রহী হতে শেখায় এ শিক্ষা। মানসম্মত শিক্ষা জাতিকে দেয় শিক্ষিত, দক্ষ জনশক্তি যা জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে দেশের কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসে।

প্রাথমিক শিক্ষা এবং সরকার ও রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা

শিক্ষা অধিকার সম্পর্কে ১৯৪৮ সালে ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা পত্রের ২৬ অনুচ্ছেদের প্রথম শর্তে বলা হয়েছে প্রত্যেকেরই শিক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে। অন্ততপক্ষে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা অবৈতনিক হবে। প্রাথমিক শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা যাতে সর্বসাধারণ লাভ করতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে। উচ্চতর শিক্ষা মেধার ভিত্তিতে সবার জন্য সমানভাবে উন্মুক্ত থাকবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭ নাম্বার অনুচ্ছেদে সবার জন্য একই পদ্ধতি গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা এবং সব শিশুর জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। ১৯৯০ সালে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয় সব শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য। ১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডের জমতিয়েন বিশ্ব শিক্ষা সম্মেলনে সবার জন্য শিক্ষা অনুমোদন লাভ করে। জমতিয়েনের পথ ধরে ২০০০ সালে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে জমতিয়েনে গৃহীত লক্ষ্য গ্রহণ করে এর সঙ্গে শিক্ষার গুণগত মানের নিশ্চয়তা যোগ দেয় এবং ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। ২০০২ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অনুযায়ী বাংলাদেশ শিক্ষা খাতে দুটি লক্ষ্য পূরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যা প্রথমত ২০১৫ সালের মধ্যে, সব শিশুর বিশেষ করে মেয়ে শিশুদের, দুর্গত শিশু ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী পরিবারের শিশুদের জন্য সম্পূর্ণ বিনা খরচে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা। দ্বিতীয়ত জেন্ডার বৈষম্য দূর করা।

প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থান চিত্র

দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা- ২০০৫ সমীক্ষার তথ্য অনুসারে বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা ১ কোটি ৭৩ লাখ ১৫ হাজার ২৯৬ জন। যার মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত শিশুর সংখ্যা ১ কোটি ৬২ লাখ ২৫ হাজার ৬৫৮ জন। স্কুল বহির্ভূত শিশুর সংখ্যা ১০ লাখ ৮৯ হাজার ৬৩৮ জন এবং ঝরে পড়া শিশুর সংখ্যা ১৩ লাখ ৩৩ হাজার ১০৪ জন। ২০০৪ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় অধীন রিচিং আউট অফ স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্পের যৌক্তিকতায় উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশে প্রায় ৩৫ লাখ শিশু এখনো প্রাথমিক শিক্ষার বাইরে রয়ে গেছে।

স্কুলের বাইরে থাকা বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত ৩৫ লাখ শিশুদের যদি দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা না যায় তা হলে দারিদ্র্যের শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ শিক্ষা না থাকা আবার শিক্ষা না থাকার কারণ হলো দারিদ্র্য। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বের হয়ে আসতে হলে শিক্ষার প্রয়োজন খুব বেশি। আর্থসামাজিক দিক দিয়ে সুযোগবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার সুযোগ এবং দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা যায় তা হলে উৎপাদনশীলতা, দারিদ্র্য বিমোচনে ইতিবাচক ফল আসবে।

আমাদের সমাজের একটি বৃহৎ অংশ শিশু। যারা সামাজিক-অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে আছে সেসব শিশুরা বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় অধীন রিচিং আউট স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্প অনুসারে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ২০০৪ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের ৭ থেকে ১৪ বছর বয়সের স্কুলে ভর্তি না হওয়া এবং ঝরে পড়া পাচ লাখ দরিদ্র পরিবারের শিশুদের বিশেষ করে মেয়েদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দেয়ার জন্য আনন্দ স্কুলের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সুযোগবঞ্চিত-পিছিয়ে পড়া শিশুরা যাতে সমতাভিত্তিক মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার জ্ঞান অর্জন করতে পারে সে জন্য প্রকল্পের কাজ পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু বাকি ৩০ লাখ দুস্থ সুযোগবঞ্চিত শিশুদের ভবিষ্যৎ কি হবে সেটি এখন সবার ভাবনার বিষয়।

জাতীয় শিশু নীতিমালা ১৯৯৪

এ নীতিমালায় ১৪ বছরের কম বয়সীদের শিশু হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ নীতিমালার অধীনে ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার কথা ছিল। জাতীয় শিশু নীতিমালার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে নৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক মূল্যবোধ অর্জনের জন্য যথাযথ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা।

বর্তমানে বাংলাদেশের প্রান্তিক পরিবারের ৩০ লাখ শিশু শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত

বর্তমানে বাংলাদেশের প্রান্তিক পরিবারের ৩০ লাখ শিশু শিক্ষাসহ সব ধরনের (খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, বাসস্থান) সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এসব হতভাগ্য শিশুদের ভাগ্য প্রতিনিয়তই ওদের পরিহাস করে। যে বয়সের শিশুদের হাতে বই নিয়ে স্কুলে যাওয়ার কথা তারা স্কুলে না গিয়ে চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধার হাত থেকে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন ঝুকিপূর্ণ কাজে অংশ নিচ্ছে।

জাতিসংঘ ২০০৩ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দশক ঘোষণা করেছে। দশকের মূল স্লোগান হলো সাক্ষরতা তথা স্বাধীনতা।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও গত ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হয়েছে। এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল *সুন্দর জীবনের জন্য সাক্ষরতা* ও শিক্ষা আনে কল্যাণ, সুখ-স্বাস্থ্য অফুরান স্লোগানকে সামনে নিয়ে সরকারি, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, শিক্ষানুরাগী ও সুশীল সমাজ দিবসের তাৎপর্য ধরে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে সারা দেশে। এ প্রতিপাদ্য ও স্লোগান তখনই বাস্তবে প্রতিফলিত হবে যখন নিরন্ন ভাগ্যবঞ্চিত ৩০ লাখ শিশুর কথা বিবেচনা করে কার্যকর প্রদক্ষেপ গ্রহণ এবং ঝুকিপূর্ণ কাজ থেকে মুক্ত করে সমৃদ্ধ জাতি গঠনে এসব শিশুদের দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করা হবে। এটা করা হলে নিরক্ষরমুক্ত, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত জাতি হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ পরিচিত হবে।